একুশের ঢেউ EKUSHER DHEU

ISSN: 2454-7182
IMPACT FACTOR: 8.158

An International Online Indexed Research Journal of Language, Literature and Culture covering Arts & Humanities as a broad area (Peer-reviewed, Refereed Journal, Quarterly)

Reflection of folk culture in selected short stories of Syed Mustafa Siraj

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের নির্বাচিত ছোটগল্পে লোকসংস্কৃতির প্রতিফলন

Name of the Author: **Sandip Ghosh**

Affiliation: **Research Scholar, Bengali Department, Burdwan University, West Bengal, India**

Abstract: Syed Mustafa Siraj is a unique architect of Bengali fiction, whose writings serve as a living document of the soil and the folk life of the people of Rarh Bengal. This analysis explores the influence of folk culture in the weaving of his narratives, specifically through the lens of three of his timeless stories: *'Gachta Bolechhilo'* (The Tree Had Spoken), *'Saaj Bhese Geche'* (The Costume Has Washed Away), and *'Goghna'* (The Cow-Killer). Siraj did not merely present factual data on folk culture; rather, he transformed folk beliefs, rituals, and folk arts into the central conflicts of his stories.

In **'Gachta Bolechhilo'**, a complex equation of human fear and political power is revealed through a blend of folk myth and magical realism. In **'Saaj Bhese Geche'**, the non-communal artistic spirit of rural folk—expressed through *Alkap* (folk theater)—is depicted alongside the tragic and endangered state of folk art within modern administrative structures. On the other hand, the story **'Goghna'** masterfully describes folk medicine, superstitions, and the deep spiritual bond between the agrarian community and their livestock—an ancient and primal human foundation of folk culture.

Overall, this discussion proves that Syed Mustafa Siraj's writing is not just a portrayal of rural reality, but a profound socio-anthropological narrative of a thousand-year-old flowing folk culture, where nature, faith, and the cries of marginalized lives converge.

Keywords: Folk Culture, Syed Mustafa Siraj, Folk Belief, Rarh Bengal, Folk Theater, Marginalized Life, Endangered Heritage

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের নির্বাচিত ছোটগল্পে লোকসংস্কৃতি প্রতিফলন

সন্দীপ ঘোষ

'লোকসংস্কৃতি' হল সাধারণ মানুষের মুখে মুখে প্রচলিত বৃহত্তর গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর ধর্মীয় ও সামাজিক বিশ্বাস , আচার-আচরণ, অনুষ্ঠান, জীবন-যাপন প্রণালী, শিল্প, বিনোদন ইত্যাদি। এসবের উপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠা সংস্কৃতিকে সহজ ভাষায় বলা হয় লোকসংস্কৃতি। আরও সহজ ভাবে বললে কোনো নির্দিষ্ট এলাকায় বসবাস করা মানুষের মুখে মখে প্রচলিত সামাজিক বিশ্বাস , আচার, রীতি-নীতি ও তাদের সংস্কৃতি ও কৃষ্টিই হল 'লোকসংস্কৃতি'।

বাংলায় আমরা যাকে লোকসাহিত্য বলি , তা ইংরেজি 'Folklore' কথা থেকে এসেছে বলেই ধরা হয়। কিন্তু 'Folklore' কথাটি শুধুমাত্র অনুবাদ প্রতিশব্দ নয়। ইংরেজি 'Folklore' কথাটি আরও ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়। ইংরেজিতে 'Folklore' বলতে যা বোঝায় তা স্পষ্ট দুই ভাগে বিভক্ত: (১) Material folklore বা লোক-শিল্প (২) Formalised Folklore বা লোকসাহিত্য। আমাদের লোকসাহিত্যকে বরং Formalised Folklore-এর প্রতিশব্দ হিসেবে গ্রহণ করা যেতে পারে। 'লোকসাহিত্য' হচ্ছে গ্রামীণ পরিবেশে বসবাসকারী সাধারণ মানুষের সৃজনধর্মী, কল্পনাপ্রবণ, সৌন্দর্যপিপাসু ও ব্যবহারিক জ্ঞানের কাব্যিক ও গদ্যধর্মী বহিঃপ্রকাশ। মৌখিক মাধ্যমে পরিভ্রমণ প্রবণতা এর প্রধান লক্ষণ। কল্পনা ও সৃজনশীলতার সংমিশ্রণে লোকসাহিত্য সৃষ্টি হলেও গ্রাম্য কবির বাস্তব অভিজ্ঞতা এর মৌলধর্মে বিদ্যমান। আদিম মানুষের চিন্তা-চেতনা ও সংস্কার-বিশ্বাস গভীরভাবে প্রতিফলিত হয়েছে লোকসাহিত্যে।

মযহারুল ইসলাম-এর মতে যে সাহিত্য সুপ্রাচীনকাল থেকে মানুষের মুখে মুখে প্রচলিত হয়ে এসেছে , এখনো প্রচলিত আছে এবং ভবিষ্যতেও থাকবে , সেগুলোই 'লোকসাহিত্য'। 'লোকসাহিত্য' এর অধিকাংশ উপাদানের স্রষ্টা ব্যক্তি, অর্থাৎ একজন, তবে সেই একজনের সম্পদ সমগ্র জাতির সম্পদে পরিণত হলে তবেই তা হয়ে ওঠে 'লোকসাহিত্য'।

'লোকসংস্কৃতি'র বিকাশের ক্ষেত্রে পল্লীজীবন বা গ্রামীণ জীবনের কথাই বেশি ধরা পড়ে। গোষ্ঠীবদ্ধ সমাজ এবং কৃষিসমাজই এর প্রকৃষ্ট ক্ষেত্র। অর্থাৎ, 'লোকসংস্কৃতি' হল সেই সমস্ত উপকরণ যেগুলো ঐতিহ্যের মাধ্যমে আমাদের হস্তগত হয় ; হস্তগত হয় মুখে মুখে , আচার-ব্যবহারের মারফত কিংবা আয়ত্ত করতে হয় চেষ্টাপ্রসূত অনুসরণ পদ্ধতির মাধ্যমে। তা 'লোকসংগীত' হতে পারে , হতে পারে 'লোককাহিনি', 'হেঁয়ালি' কিংবা 'প্রবাদ' অথবা অন্যান্য উপকরণসমূহ যেগুলি শব্দের বাঁধনে বিধৃত এবং প্রচলিত।

লোকসংস্কৃতিবিদগণ পরবর্তীতে ক্রমশ মৌখিক ভাষা বহির্ভূত বিষয়কেও লোকসংস্কৃতির পরিধিভুক্ত করতে থাকেন। সেখানে স্থান পায় সংহত জনগোষ্ঠীর সামগ্রিক জীবনচর্যা ও মানসচর্যা। তাদের নিজস্ব আচার-আচরণ-অনুষ্ঠান, বিশ্বাস-সংস্কার, রীতি-নীতি বোধ, খাদ্য ও পরিচ্ছদের বিশিষ্টতা , শিল্প, সাহিত্য, সঙ্গীত, নৃত্যকলা ইত্যাদি। এরকমই একজন বিখ্যাত লোকসংস্কৃতবিদ হলেন সৈয়দ মুস্তফা সিরাজ। সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ মুর্শিদাবাদ জেলার কান্দির অন্তর্গত খোসবাসপুর গ্রামে ১৯৩০ সালে জন্ম গ্রহণ করেছেন। মুর্শিদাবাদের রাঢ় অঞ্চল বা হিজলের প্রকৃতির সঙ্গে সঙ্গে সেখানকার মানুষজনকেও খুব কাছ থেকে জেনেছিলেন । ১৯৫০

সালে আলকাপ দলে দীর্ঘ ছ'বছর যুক্ত থাকার জন্য এই গ্রামীণ জীবনকে সহজেই জানার সৌভাগ্য হয়েছে তাঁর পক্ষে। পঞ্চাশের দশকের শেষের দিকে তিনি ছোটগল্পের জগতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। গ্রাম ও গ্রামের মানুষজনই তাঁর ছোটগল্পে উঠে এসেছে। মূলত গ্রামীণ জীবন নিয়ে লেখা তাঁর কাছে দায়বদ্ধতাস্বরূপ বলে মনে হয়েছে। কারণ দেশভাগের পরে গ্রামেও অনেক ভাঙ্গা গড়া হয়েছে। গ্রামের এই ভাঙ্গাগড়া জীবনের সাক্ষী তিনি। তাই এই জীবনকে নিয়ে না লেখা তাঁর কাছে আত্মপ্রবঞ্চনা ছাড়া আর কিছুই নয়। এই জীবন নিয়ে লিখতে বসে হিন্দু মানুষ, মুসলমান মানুষ আলাদা বলে কিছু মনে করেননি। যথার্থ বাঙালি জীবনের চিত্র তাঁর কলমের ডগা দিয়ে উঠে এসেছে। যাঁর লেখার কোনায় কোনায় ছড়িয়ে রয়েছে লোকসংস্কৃতির কথা।

ছোটোগল্পের হাত ধরেই কথাসাহিত্যে সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের পদার্পণ। এখানে তাঁর বিশেষ কয়েকটি ছোটোগল্প নিয়ে আলোচনার সূত্রে অনুসন্ধান করে দেখার চেষ্টা করেছি যে মুস্তাফা সিরাজের মননে লোকসংস্কৃতির প্রভাব কতটা গভীরভাবে প্রোথিত ছিল। সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের বিভিন্ন গল্পে বারেবারে উঠে এসেছে প্রকৃতির সঙ্গে তাঁর সম্পৃক্ততার কথাও।

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের 'গাছটা বলেছিল' গল্পটি লোকবিশ্বাস ও প্রকৃতি-মানুষের সম্পর্কের এক অনন্য বর্ণনা। এই গল্পে গ্রামের মানুষ, প্রকৃতি এবং রাজনৈতিক শক্তিগুলো এমনভাবে জড়িয়ে পড়ে যে বাস্তবতা আর অলৌকিকতার সীমারেখা অস্পষ্ট হয়ে যায়। জাদুবাস্তবতার আবহে ভর করে গল্পটি একদিকে যেমন রহস্যময় , অন্যদিকে তেমনি লোকজসংস্কৃতির গভীর মর্ম বোঝাতে সক্ষম।

গল্পের পটভূমি বসন্ত ঋতু, সাল ১৯৮৮। বসন্ত সাধারণত নবজাগরণের প্রতীক হলেও এখানে বসন্তই হয়ে ওঠে মৃত্যুর ঋতু। গ্রামের বাইরে নো-ম্যান্স-ল্যান্ডে দাঁড়িয়ে আছে এক প্রাচীন ফুল-ফলহীন গাছ , যাকে লেখক ও ডাক্তার অসীম বোস নাম দিয়েছেন 'বৃহন্নলা'- "আই নো আই নো! বৃহন্নলা![১]

এই নামের মধ্যেই লুকিয়ে আছে লোকবিশ্বাসের রহস্যময়তা—উভলিঙ্গ , পুরাণসম রূপ, শক্তিধারী অথচ নীরব। গাছটির এই অদ্ভুত নীরবতাই একসময় পরিণত হয় মৃত্যুর অমোঘ উচ্চারণে। লোকবিশ্বাসে গাছকে দেবতা রূপে দেখা হয় , গাছ আত্মার আশ্রয় , আবার কখনও অভিশপ্ত সত্তার প্রতীক। এই গ্রামেও সেই বিশ্বাসের রেশ আছে। গাঁওবুড়োরা বলে—"কোনও -কোনও পাখি যেমন মানুষের ভাষা শেখে, কোনও-কোনও গাছও মানুষের ভাষা শেখে।"[২] আর এই গাছটা 'মর মর মর' বলে মৃত্যুদণ্ড ঘোষণা করে।

গল্প শুরু হয় পাতাকুড়ুনে বুড়ির অভিজ্ঞতা দিয়ে। গাছের তলায় পাতা কুড়োতে গিয়ে সে শুনতে পায় সেই অমোঘ স্বর— "মর্ মর্ মর্।"[৩] ভয়ে পালিয়ে গেলেও বাড়ি গিয়ে তার মৃত্যু ঘটে। যদিও ডাক্তারদের মতে এটি হার্ট অ্যাটাকে মৃত্যু , কিন্তু গ্রামীণ বিশ্বাসে গাছই তাকে ডেকে নিয়েছে। এরপর একে একে গাঁজাখোর সিনিক প্রৌঢ়, পাঁচু চোর এবং দারোগাবাবুর সঙ্গেও একই ঘটনা ঘটে। প্রত্যেকেই গাছের কাছে গিয়ে 'মর মর মর' ধ্বনি শুনেছে বলে দাবি করে। কেউ লাথি মেরেছিল গাছকে , কেউ লুকোতে গিয়েছিল , কেউ আবার কৌতূহলে গেছে। তাদের মৃত্যুর কারণ বিজ্ঞানসম্মত—হৃদরোগ , যক্ষা, দীর্ঘ অসুস্থতা—কিন্তু লোকবিশ্বাসে এগুলো গাছের অভিশাপ ছাড়া আর কিছুই নয়। এই সময় গল্পের কথক শহর থেকে আসা ডাক্তার অসীম বোসের সঙ্গে গাছটি দেখতে যান। কথক ও অসীম বোস নিজেরা যুক্তিবাদী , অলৌকিকতাকে বিশ্বাস করেন

না। তবু গাছের নৈঃশব্দ্য ভেদ করে 'মর মর মর' শব্দ শুনে তারাও স্তম্ভিত হন। যদিও পরদিন জানা যায় ডাক্তার অসীম বোসের মৃত্যু গাছের অভিশাপে নয় , বরং প্রেমে প্রত্যাখ্যাত হয়ে আত্মহত্যা। এই ঘটনাই স্পষ্ট করে যে গাছ নয়, মানুষের মধ্যকার জটিল মনস্তত্ত্ব, দুঃখ, হতাশা ও গ্রামীণ কুসংস্কারই মৃত্যুর পেছনের প্রকৃত কারণ।

এরপর দেখা যায় গাছকে কেন্দ্র করে গ্রামের সামাজিক ও রাজনৈতিক সংঘাত বাড়তে থাকে। সরকারি জমিতে দাঁড়িয়ে থাকা এই বৃহন্নলা গাছটি কেটে ফেলতে চায় পঞ্চায়েত। অন্যদিকে কিছু মানুষ এটিকে দেবতারূপে প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা শুরু করে— "সহসা গাছটার তলায় ঢাকঢোলের শব্দ! কাঁসির শব্দ।"[৪] লোকসাংস্কৃতিক রীতিনীতির ব্যবহার এখানে স্পষ্ট। অজানা শক্তিকে শান্ত করতে সংগীত-আচার-অনুষ্ঠান। এর বিপরীতে রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের লোভে গাছকে 'বিপজ্জনক' ঘোষণা করে কেটে ফেলার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। স্থানীয় কাঠুরিয়ারা ভয়ে পিছপা হওয়ায় দূর থেকে করাতি আনা হয়। এই অবস্থায় গ্রামবাসী দুই দলে বিভক্ত—একদল কুসংস্কারে উদ্বুদ্ধ হয়ে গাছ রক্ষায় মরিয়া , অন্যদল কুসংস্কারের আড়ালে রাজনৈতিক স্বার্থসিদ্ধিতে ব্যস্ত।

এই বিভেদ ও উত্তেজনার মুহূর্তে গল্পের কথক নিঃশব্দে গাছের কাছে প্রার্থনা করেন—"বৃহন্নলা !, তুমি কথা বলো! বৃহন্নলা! এই সব দ্বিপদ প্রাণীগুলির তড়পানি কেন সহ্য করছ তুমি ? তুমি স্বয়ং প্রকৃতি এ দৌরাত্ম্য অসহ্য।"[৫] ঠিক তখনই বাতাসে ভেসে আসে সেই প্রত্যাশিত ধ্বনি—'মার মার মার'। আর তার সঙ্গে সঙ্গেই মানুষ নিজের স্বভাবসিদ্ধ হিংস্রতায় যেন প্রকৃতির ভাষাকে রক্তাক্ত করে তোলে। দুই পক্ষের সংঘর্ষে বোমা ফাটতে থাকে, রক্ত ছড়িয়ে পড়ে, নো-ম্যান্স-ল্যান্ড লাল হয়ে ওঠে। বসন্ত দিনের স্নিগ্ধ প্রকৃতি রক্তিম সৌন্দর্যে পরিণত হয়—কিন্তু এই রক্তিমতা প্রকৃতির নয়, মানুষের আহ্বানে ডেকে আনা মৃত্যু।

অবশেষে বৃহন্নলা গাছটি দাঁড়িয়ে থাকে সেই জায়গাতেই—অনন্ত মৌনের প্রতীক হয়ে। গাছের কোনও অলৌকিক শক্তিই ছিল না; মানুষের ভয়, লোভ, কুসংস্কার ও রাজনৈতিক স্বার্থই তাকে ভয়ঙ্কর রূপ দিয়েছিল। সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ লোকবিশ্বাস, অলৌকিক কল্পনা ও জাদুবাস্তবতার আবরণে আসলে দেখিয়েছেন কিভাবে মানুষ নিজেই প্রকৃতির সঙ্গে সম্পর্ক নষ্ট করে, কিভাবে বিশ্বাসকে অস্ত্র বানিয়ে সমাজকে বিভক্ত করে।

এইভাবে 'গাছটা বলেছিল' গল্পটি কেবল পরপর মৃত্যুর রহস্য নয় , বরং বাংলার গ্রামীণ লোকসংস্কৃতি , প্রকৃতির প্রতি মানুষের বিশ্বাস , ভয়, ভক্তি এবং ক্ষমতার রাজনীতির এক সুস্পষ্ট ও তীব্র সমালোচনা। গল্পটি লোকজ পুরাণের আভাসে নির্মিত হলেও এর ভিতরকার সত্যটি সমাজ বাস্তবতার কঠিন মাটি থেকেই উঠে এসেছে।

সাজ ভেসে গেছে

মুর্শিদাবাদের কান্দি থানার অন্তর্গত গোকর্ণের মাদারহাটি গ্রামের বন্যার পরিপ্রেক্ষিতে সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের 'সাজ ভেসে গেছে' গল্পটি একটি গভীর , মর্মস্পর্শী লোকসংস্কৃতির দলিল হয়ে ওঠে। লেখকের জন্ম ও বেড়ে ওঠা এই অঞ্চলের হওয়ায় তিনি যে লোকজ অভিজ্ঞতার ভেতর দিয়ে গল্পের শরীর নির্মাণ করেছেন , তা নিছক কাহিনি নয় । গ্রামীণ মানুষের শিল্পচেতনা , বিশ্বাস-সংস্কার, পারস্পরিক সহাবস্থান এবং লোকনাট্যের

প্রাণশক্তিকে কেন্দ্র করে নির্মিত এক জীবন্ত সমাজ-নৃবৈজ্ঞানিক চিত্র। একটি বন্যা ভাসিয়ে নিয়ে যায় পালাগান দলের সাজের বাক্স—সেখান থেকেই শুরু হয় গ্রামের বিনোদন , বিশ্বাস ও লোকনাট্যকেন্দ্রিক সংস্কৃতির বিপর্যয়ের বৃত্তান্ত।

সরকারি সমাজশিক্ষা অফিসারের কাছে যখন দলের সদস্যরা অনুদান চাইতে আসে , তখন একে একে উন্মোচিত হয় তাদের পরিচয় , ইতিহাস, স্বপ্ন, পরিশ্রম ও লোকায়ত শিল্পের প্রতি নিঃশর্ত আনুগত্য। দলের নেতা মইলোবাস—যার প্রকৃত নাম মওলা বখশ—একদিন ছিলেন এলাকার সেরা পালোয়ান। মালামো কুস্তির সেই লোকক্রীড়া, যা গ্রামবাংলার কৃষ্টিবিধানের বিশ্বাস-সংস্কার, ঢোলের বোল এবং জনতার উল্লাসে মিশে যেত, আজও তার স্মৃতির ভেতর অটুট। পাঁজরের ভাঙা হাড়ের যন্ত্রণা সত্ত্বেও অভিনয়ের মুহূর্তে যখন সে চাঁদ সদাগরের সাজ পরে, তার ক্লান্ত শরীর যেন মুহূর্তে পায় পৌরাণিক শক্তির আভা— “অথচ যেদিন থেকে চাঁদ সদাগরের সাজ গায়ে চড়াল, যেন ভাঙা ঝাঁঝরা শরীলের মধ্যে এসে দাঁড়াল এক বিশাল শক্তিধর পুরুষ। যতক্ষণ সাজ গায়ে থাকে, ততক্ষণ সে সেই বীর্যবান দুর্ধর্ষ পুরুষ।”[৬] লোকনাট্যের চরিত্র তখন তাকে যেমন রূপান্তরিত করে, তেমনি তাকে এক অলৌকিক আত্মবিশ্বাসও প্রদান করে। এই রূপান্তরই লোকনাট্যের প্রধান মর্ম—সাজ পরার সঙ্গে সঙ্গে মানুষ হয়ে ওঠে অন্য কেউ, অন্য শক্তির বাহক।

একইভাবে অমূল্য বাউরি কিংবা আকাশ আলীর মতো অভিনেতারা নিজেদের ব্যক্তিজীবনের যন্ত্রণাকে পেরিয়ে বেহুলা-লখিন্দরের প্রেম , বেদনা, মিথ ও অলৌকিকতার ভুবনে আত্মস্থ হয়। গ্রামবাংলার আদি লোককথা, দ্বারকানদীর জোৎস্না, লখিন্দরের মিথ, এবং হাজার বছরের গ্রামীণ বিষাদের প্রতিফলন তাদের অভিনয়ে জেগে ওঠে। এই পুনরাবৃত্ত লোকবিশ্বাসই গড়ে তোলে গ্রামের মানুষের সাংস্কৃতিক পরিচয়—হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে। লোকসংস্কৃতির এই সম্মিলনই সিরাজের গল্পে সবচেয়ে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। মুসলমান পরিবারে জন্ম নিয়েও কেউ তবলচি ‘নারাণবাবু’ , কেউ বা বেহুলার চরিত্রে অভিনয় করে , আবার হিন্দু ছড়াদাররা শাস্ত্রজ্ঞ রমজানের কাছে পৌরাণিক তত্ত্ব শিখে কবির লড়াইয়ে যায়—এই মেলবন্ধনই গ্রামীণ লোকসংস্কৃতির প্রকৃত শক্তি।

গল্পটিতে লোকনাট্য, বোলান, সঙের গান, গাজন উৎসব, নবান্ন, কবির লড়াই—এই সবই মুর্শিদাবাদের বিস্তীর্ণ গ্রামাঞ্চলের প্রাণস্পন্দন হিসেবে উঠে এসেছে। এই সব শিল্পচর্চা শুধু বিনোদনের মাধ্যম নয় ; এগুলো গ্রামীণ মানুষের বিশ্বাস, দৈনন্দিন জীবন, সমাজসম্পর্ক, এবং প্রকৃতিনির্ভর অস্তিত্বের অন্তর্গত অঙ্গ। বন্যা যখন এই লোকগানের সাজ-সরঞ্জাম ভাসিয়ে দেয় , তখন তা শুধু কিছু পোশাক বা প্রপসের ক্ষতি নয়—হারিয়ে যায় একটি সংস্কৃতি, একটি সম্প্রদায়ের ঐতিহ্য, তাদের আত্মপরিচয়ের অবলম্বন।

একারণে অফিসারের প্রশ্ন , অনুদান প্রত্যাখ্যান , বা তাঁর লোকসংস্কৃতি সম্পর্কে অজ্ঞতা দলটিকে ভীষণভাবে আঘাত করে। শহুরে প্রশাসনিক কাঠামোর সঙ্গে গ্রামীণ লোকসংস্কৃতির ফাঁক এখানেই প্রকট হয়ে ওঠে। অফিসের পরিবেশ যখন অমূল্যের গলায় লোকগান শুনে মুহূর্তিক আবেগে আলোড়িত হলেও শেষ পর্যন্ত প্রশাসনিক নিয়মই জয়ী হয়। লোকসংস্কৃতি , যেটি মানুষের বাঁচার সহায় , আনন্দের অবলম্বন, এবং একান্ত নিজস্ব পরিচয়—সেটি সরকারি খাতায় ‘কালচারাল অনুদান’-এর জায়গা পায় না।

সবশেষে যখন দলটি ব্যর্থ মন নিয়ে ফিরে যায় এবং পথের মাঝেই হারিয়ে যায় মইলোবাস , তখন তার মৃত্যুর দৃশ্য যেন লোকনাট্যের চূড়ান্ত ট্র্যাজেডিকে বাস্তবে এনে দেয়। সে মৃত্যু যেন সাজহীন চাঁদ সদাগরের মৃত্যু—লোকসংস্কৃতির আহত প্রাণের মৃত্যু। প্রকৃতি তাকে শেষবারের মতো রক্তের মতো লাল পোশাকে ঢেকে দেয়, যেন নাট্যমঞ্চ আর বাস্তব এক হয়ে যায়। মৃত্যুর মুহূর্তেও তার শেষ কথা—"সাজের বাকসোটা ভেসে গেল হে! সাজের বাকসোটা"[৭]—লোকসংস্কৃতির ক্ষয়, অবহেলা, এবং বিপন্নতার একটি দগদগে প্রতীক হয়ে ওঠে।

গল্পের পরিসমাপ্তি পাঠকের মনে দীর্ঘস্থায়ী বিষাদ রেখে যায়। 'সাজ ভেসে গেছে' শুধু একটি দল হারানোর গল্প নয়—এটি গ্রামীণ লোকায়ত সংস্কৃতির প্রতি মানুষের গভীর মমতা , বিশ্বাস, আন্তরিকতা, এবং এই সংস্কৃতি রক্ষা না করার ফলে যে অপূরণীয় ক্ষতি হয় তার নির্মম দলিল। লোকসংস্কৃতির এই প্রাণস্পন্দনই সিরাজের গল্পকে জীবন্ত, হৃদয়স্পর্শী এবং কালজয়ী করে তোলে।

গোঘ্ন

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের গল্প 'গোঘ্ন' মানুষের সঙ্গে পশুর আদিম সম্পর্ককে লোকজ-সংস্কৃতির গভীরতর আবেগে তুলে ধরে। কৃষিভিত্তিক বাংলার গ্রামীণ সমাজে বলদ শুধু শ্রমসঙ্গী নয়—সন্তানসম স্নেহের , সংসারের অবিচ্ছেদ্য সদস্য। সেই আবেগ নিয়েই গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র হারুন আলি বা হারাই তার বামজোতের বলদ 'ধনা'কে বাঁচাতে রাত পেরোনো এক ভয়াবহ যাত্রায় বেরিয়ে পড়ে। গল্পজুড়ে মানুষের সঙ্গে প্রাণীর সম্পর্ক , লোকবিশ্বাস, কৃষিজীবনের বাস্তবতা , আঞ্চলিক পদাবলি ও বস্তুকেন্দ্রিক লোকসংস্কৃতির নানা উপাদান এমনভাবে মিশে গেছে যে 'গোঘ্ন' হয়ে উঠেছে বাঙালির গ্রামীণ লোকজীবনের এক অনবদ্য দলিল।

বাঘরি অঞ্চলের মানুষরা বহুদিন ধরে রাঢ়ের সঙ্গে যে আদান-প্রদান চালিয়ে আসছে—ফলমূল , সবজি, খেতের উৎপাদন নিয়ে তারা আসে রাঢ়ের হাটে , আর ফেরে সাদা ঝকঝকে সুস্বাদু 'শাহদানা' আমন ধান নিয়ে—এই অর্থনৈতিক সম্পর্কের ভেতরেও ফুটে ওঠে দুই অঞ্চলের সংস্কৃতি-বিনিময়। হারাই যখন চারু মাস্টারের মেয়ের বিয়েতে ভাই দোলাইয়ের দেওয়া কথা পালন করতে কলাই-কুমড়ো নিয়ে আসে , তখন তার যাত্রাপথ, গরুর গাড়ি সাজানো - "ধুরিতে রেড়ির তেল মাখানো হয়ে গেছে। প্রথম প্রহর শেষ হলে আদাড়ে শেয়াল ডাকে"[৮] —এসব বস্তুবিশ্ব শুধু ন্যূনতম উপকরণ নয়, গ্রামজীবনের লোকসংস্কৃতির পূর্ণাঙ্গ পরিসর। আর বাঘরির মানুষের লোকের খাদ্য—"ইয়া মোটা মাসকলাই আটার লাহারি। ছাতু। ভুজা। আম-কাঁঠালের সঙ্গে গেঁহুর আটার চাপড়ি।"[৮] গ্রামবাংলার খাদ্যসংস্কৃতির এক অকৃত্রিম দলিল।

এই লোকজ পরিসরের মধ্যেই ধনার অসুস্থতা গল্পকে টেনে নিয়ে যায় রাঢ়ের লোক-চিকিৎসা , বিশ্বাস-অবিশ্বাস এবং আধিভৌতিক লোকমিথের জগতে। সানকিভাঙার কাছে গোবদ্যি পিরিমলের চরিত্র যেন এক পুরানো লোকবিশ্বাসের প্রতীক—যে রোগের নাম নিতে পারে 'শিসটানা', 'বাঘতড়পা', 'মুসকো' বা 'ছ্যারানি', যে শুকনো লতানে ঘাস দিয়ে মন্ত্র পড়ে গরুর মাথা থেকে লেজ পর্যন্ত বুলিয়ে জলে ফুঁ দেয় , শিকড়-বাকড় মিশিয়ে জাদুবলির মতো চিকিৎসা করে । এইসবই গ্রামবাংলার গভীর লোকচিকিৎসার ঐতিহাসিক ধারার অংশ। পিরিমলের মুখে কালুদিয়াড়ের ইসমিলের 'আপ্তহত্যে'র কাহিনি , শুকনো ছালছাড়ানো ডাল—লোকমিথ ,

ভূত-জিন, অশরীরী আতঙ্কের সেই দীর্ঘচর্চিত বয়ান গ্রামীণ মানসজগৎকে বাস্তবের সমান্তরালে বহমান রাখে। হারাইয়ের মনে তখন বুক ধড়ফড়ানো ভয়—তার চারপাশের রাত যেন ভরে ওঠে ডাকিনী , শেয়াল, শামুকের খোল, ঝিনুকের কাঁপুনিতে। কিন্তু এই ভয়ও সে কাটিয়ে ওঠে একান্ত যেহেতু সে রাতচরা গাড়োয়ান , আর তার পথের সঙ্গী বহুদিন ধরেই বিভিন্ন রূপের ইসমিল—কখনও শেয়াল, কখনও মানুষ, কখনও অদ্ভুত পাখি।

ধনা যখন আর হাঁটতে পারে না , তখন হারাই তাকে 'মানুষের মতো' শাসন করে , আদর করে, আবার অভিশাপ দিয়ে কাঁদতে কাঁদতে জোয়ানে তুলতে চায়—পোষ্য বলদের প্রতি মানুষের এই আত্মীয়তার বোধই গল্পের প্রাণ। তার কাছে ধনা-মনা দুই বলদই সন্তানতুল্য— " ধনা-মনাও হামারঘে দুই ব্যাটা।"[৯] পরিবারের রুটি-রুজির উৎস। তাদের মৃত্যু মানে পরিবারের মৃত্যু। তাই ধনার মাথায় হাত বুলিয়ে তার সঙ্গে কথা বলা , তাকে 'ব্যাটা' বলে ডাকা , কিংবা তাকে বাঁচানোর জন্য নিজের কাঁধে জোয়ান তুলে গাড়ি টেনে নেওয়া—এসব শুধু সংগ্রামের দৃশ্য নয়, বাঙালির লোকজ জীবনধারার গভীর মানবিকতার প্রকাশ।

আরও এক লোকসংস্কৃতির দিক উঠে আসে হারাইয়ের স্মৃতিতে—ধনা প্রথম যখন ঘরে আসে , তার 'বহু' চারপা মুছে দেয় কেশ দিয়ে , পদ্মার জল এনে নামাজ পড়ে তার মঙ্গল কামনা করে। লোকাচার , পোষ্যপ্রীতি, ধর্মবিশ্বাস, দৈনন্দিন আচার—সব মিলিয়ে গরুকে ঘিরে এক পারিবারিক লোকসংস্কৃতি গড়ে ওঠে , যার প্রতিটি ইশারাতেই থাকে মমতা, কৃতজ্ঞতা ও টিকে থাকার প্রার্থনা।

গল্পের এক পর্যায়ে হাজির হয় দিলজান কসাই—যে মৃত্যুপথযাত্রী ধনাকে কিনে নিতে চায়। লোকবিশ্বাসে জড়ানো ভয়ার্ত পরিবেশে সে যেন আজরাইলের রূপ নেয়। ধনাকে রক্ষা করতে ব্যাকুল হারাই তার উপস্থিতিকে অশুভ সংকেত বলে মনে করে। কিন্তু ভাগ্যের নিষ্ঠুরতায় শেষপর্যন্ত সেই দিলজানই তাকে ধনার মৃতদেহের বিনিময়ে ত্রিশ টাকা গুঁজে দেয়। সন্তানসম বলদের মৃত্যুতে হারাইয়ের আর্তনাদ তখন ফেটে পড়ে লোকজ বেদনার গভীরতায়—একটি পরিবারের সম্বল হারানোর যন্ত্রণা তার চোখের জলে রূপ পায়।

গল্পের শেষ ভাগে বদর হাজির আখের গুড় তৈরি নিয়ে যে অংশটি আসে , তা রাঢ় অঞ্চলের লোকবিশ্বাসের আরেক গুরুত্বপূর্ণ দলিল। 'দোয়াদরুদ' পড়া , 'সু-কু'-এর দৃষ্টি এড়ানো, শয়তান খেদানো, আর সবশেষে 'আবে-জমজম' ছেটানো—এসব বিশ্বাসের ভেতর দিয়ে গ্রামীণ মানুষের দৈনন্দিন উৎপাদন কেন্দ্রিক লোকসংস্কৃতি ফুটে ওঠে। এর মধ্যেই হাজি সাহেব হারাইকে আশ্রয় দেন , সাহায্যের হাত বাড়ান—গ্রামীণ মানুষের পারস্পরিক সহমর্মিতা ও সমবায়ী সমাজসংস্কৃতির আরেক দৃষ্টান্ত।

'গোঘ্ন' তাই শুধু একটি কৃষকের বলদ হারানোর গল্প নয়—এটি বাঙালির গ্রামীণ লোকাচার , পশুপ্রীতি, বিশ্বাস-অবিশ্বাস, আঞ্চলিক ভাষা, খাদ্যসংস্কৃতি, চিকিৎসা-পদ্ধতি ও মানুষের সহমর্মিতার অনুপম চিত্র। মানুষের সঙ্গে প্রাণীর যে গভীর সহাবস্থান বাংলা লোকসংস্কৃতির একটি চাবিকাঠি। মুস্তাফা সিরাজ সেই লোকজ অভ্যাস, আবেগ, ভয়-আশা, ধর্মবিশ্বাস এবং মমতার রূপকেই এই গল্পের প্রতিটি জায়গায় অসাধারণভাবে রূপায়িত করেছেন।

পরিশেষে বলা যায় , সৈয়দ মুস্তফা সিরাজের ছোটগল্প কেবল গ্রামীণ জীবনের নিছক প্রতিচ্ছবি নয় , বরং তা বাংলার লোকসংস্কৃতির এক জীবন্ত ও চলমান ইতিহাস। 'গাছটা বলেছিল' , 'সাজ ভেসে গেছে' এবং

'গোঘ্ন'—এই তিনটি গল্পের মাধ্যমে লেখক প্রমাণ করেছেন যে , লোকসংস্কৃতি কোনো স্থবির বিষয় নয় ; এটি মানুষের বিশ্বাস, অস্তিত্বের সংকট এবং প্রকৃতির সাথে লড়াইয়ের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ।

সিরাজ অত্যন্ত মুন্সিয়ানার সাথে দেখিয়েছেন যে, বিজ্ঞানের যুগেও মানুষের অবচেতনে লৌকিক বিশ্বাস কতটা গভীর (যেমন 'গাছটা বলেছিল')। আবার 'সাজ ভেসে গেছে' গল্পের মাধ্যমে তিনি আধুনিকতার চাপে পিষ্ট হতে থাকা ঐতিহ্যবাহী লোকশিল্পীদের যে হাহাকার তুলে ধরেছেন , তা আমাদের সাংস্কৃতিক দেউলিয়াপনাকেই চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়। 'গোঘ্ন' গল্পে মানুষ ও পশুর যে প্রাগৈতিহাসিক মমত্ববোধ চিত্রিত হয়েছে, তা মূলত বাংলার কৃষিভিত্তিক সমাজ ও তার লৌকিক নৈতিকতারই বহিঃপ্রকাশ।

মুস্তফা সিরাজের কৃতিত্ব এখানেই যে, তিনি লোকসংস্কৃতিকে কেবল 'সাজসজ্জা' হিসেবে ব্যবহার না করে তাকে গল্পের আত্মার সাথে মিশিয়ে দিয়েছেন। তাঁর কলমে রাঢ় বাংলার মাটি ও মানুষের যে মহাকাব্য রচিত হয়েছে, তা বাংলা সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ। তাঁর গল্পগুলো আমাদের এই বার্তাই দেয় যে , শিকড়চ্যুত হয়ে নয়, বরং নিজের লোকজ ঐতিহ্যকে ধারণ করেই মানুষ তার প্রকৃত পরিচয় খুঁজে পায়। তাই সমকালীন সাহিত্যের প্রেক্ষাপটে সিরাজের গল্পের প্রাসঙ্গিকতা আজও অম্লান এবং তা ভবিষ্যৎ প্রজন্মের গবেষকদের জন্য এক অফুরন্ত প্রেরণার উৎস।

তথ্যসূত্র :

১। মুস্তাফা সিরাজ, সৈয়দ ; *সেরা ৫০টি গল্প* ; দে'জ পাবলিশিং ; কলকাতা ; ১৪২৩ ; পৃ. ১৬
২। তদেব, পৃ. ৯
৩। তদেব, পৃ. ৯
৪। তদেব, পৃ. ১৭
৫। তদেব, পৃ. ১৮
৬। তদেব, পৃ. ২৫
৭। তদেব, পৃ. ২৬
৮। তদেব, পৃ. ৫২
৯। তদেব, পৃ. ৫৮